থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE
An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-19

Editor of
Autumn Edition 2019
Dr. Saurav Dasthakur
Associate Professor, Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal

Title: সমাজ চেতনায় মেয়েলীগীত: ভাঁটিপূজা [*Samaj Chetonai Meyeli Geet Vati Puja*]

Author(s): Sanjoy Mondal

Published: 23 December 2019.

সমাজ চেতনায় মেয়েলীগীত: ভাঁটিপূজা © 2019 by Sanjoy Mondal is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 7, Issue 10-14, 2019

Autumn Edition
September-October

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সমাজ চেতনায় মেয়েলীগীত: ভাঁটিপূজা

- সঞ্জয় মণ্ডল
পি.এইচ.ডি রিসার্চ স্কলার,
সঙ্গীত ভবন, বিশ্বভারতী,
শান্তিনিকেতন

> সমাজের প্রধান উপকরণ মানুষ, মানুষই সমাজ নিয়ন্ত্রক। মানব-জীবনের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণকে ভিত্তি করেই সমাজের সৃষ্টি, ব্যাপ্তি এবং শ্রীবৃদ্ধি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পার্থিব-পারলৌকিক উভয় জীবনের মঙ্গলামঙ্গলকে কেন্দ্র করে ধর্মশাস্ত্রের মৌলিক বিধানের সঙ্গে আরো কিছু লৌকিক আচার, ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্যতা লাভ করেছে। সকল মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণে ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ অনুশাসন নাও থাকতে পারে, কিন্তু লোকাচার অজ্ঞাতভাবেই জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এইসব ধর্মীয় বিধান এবং লৌকিক আচার-আচরণের সামগ্রিকতার মধ্যেই সমাজের প্রকৃত রূপ নিহিত। (মহম্মদ আব্দুল জলিল ১)

লোকাচার মানে লোকের আচার। 'লোক' অর্থে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ। তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণই লোকাচার। তাদের উৎসব সমূহ হল লোক-উৎসব। তাদের ধর্ম লোকধর্ম। লোকাচার কখনও কখনও প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেও ছাপিয়ে যায়। বাংলা নববর্ষ, যাত্রাগান, খেজুর ভাঙা বা চড়ক পূজা সহ বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানাদি তার প্রমাণ। বিভিন্ন সমাজের লৌকিক আচার বিভিন্ন রকমের হয়। কখনও কখনও তা একেবারেই স্বতন্ত্র হয়, কখনও আবার সেখানে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এসব সামাজিক আচরণাদি পরিবারের সদস্য তথা আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে গাছপালা,

ISSN 2321-4805

গৃহপালিত পশুপাখি, জীবজন্তু প্রভৃতির জন্যও পালন করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সব লৌকিক আচার-আচরণ বা ধর্মীয় কার্যকলাপের অধিকাংশই শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের ভালোর জন্যই নয়; বরঞ্চ তা সমাজের তথা সমগ্র দেশ ও জাতির মানুষের উন্নতির কথা ভেবেই করা হয়। অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায় বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এক অতি জনপ্রিয় গান 'ভাঁটিপূজার গান'। এই পূজা খুলনার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমনঃ ভাঁটিপুজো বা ভাঁটিপূজার গান, ভাঁটির গান, ফুল ভাঁটানের গান, ভাঁটি দেয়া বা কুলো ভাসানের গান ইত্যাদি। এ পূজার নাম আলাদা হলেও বিষয়বস্তু একই। পূজা পদ্ধতিতেও রয়েছে মিল।

"ভাঁট বা ভাঁটি এক প্রকার জংলি ঔষধি গাছ। সাধারণত রাস্তার পাশে অযত্নে, অবহেলায় এ গাছের জন্ম, বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকা। ভাঁটগাছ বা ভাঁটিফুল গাছ প্রসঙ্গে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ একটি কবিতায় লিখেছেন:

ভাঁট আঁশ শ্যাওড়ার বন

বাতাসে কী কথা কয় বুঝি নাকো,

বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে

পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি,

হায়, এমন বিজন"।

(ভাঁট ফুল - দৈনিক প্রথম আলো ২)

তিনি আরও লিখেছেনঃ

বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল

ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়...।

পুরাণ কাহিনী ‘বেহুলা লক্ষীন্দর’-এর নায়িকা বেহুলার পায়ের ঘুঙুরকে কবি ভাঁটফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রিয়তম পতি লক্ষীন্দরের সাপের কামড়ে মৃত্যুর পর, সতী স্ত্রী বেহুলা তাকে বাঁচানোর সব চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তিনি নেতাই ধোপানীর সঙ্গে স্বর্গলোকেও যান। নৃত্যকলা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারলে স্বামী আবার জীবিত হয়ে উঠবে, সেই আশায় বেহুলাকে রাজসভায় নৃত্য প্রদর্শন করতে হয়। কবি সেই নৃত্যরত বেহুলাকে কল্পনার চোখে দেখতে পান তিনি ভাঁটফুলের ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নৃত্য করছেন। তাই কবির ভাষায় ভাঁটফুল বেহুলার পদচিহ্নও বটে। ভাঁটি ফুলের আর এক নাম ঘন্টকর্ণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বিভিন্ন লেখায় এই ফুলটিকে ‘ভাঁটি’ নামে সম্বোধন করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

আশে-পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া

রয়েছে দলে দলে...।

“রবীন্দ্রনাথের ‘সে’ শিরোনামে লেখা গল্পটিতে পাওয়া যায় এই ঘন্টাকর্ণকে। গল্পের একটি চরিত্র ঘন্টাকর্ণ-এর দুই কানে দুই ঘন্টা। লেজও দুটি। দুই লেজে দুই হাতুড়ি। ওগুলো দিয়ে নিজেই নিজের ঘন্টা বাজিয়ে যায়” (মোরসালিন মিজান ৩)।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ঘন্টকর্ণ নাম হয়েছে সম্ভবত শুঁটির ভিতর বীজগুলি শুকিয়ে ঝুনঝুন আওয়াজ করে বলে। ফুলের প্রকৃতি, আকৃতি-তে অন্য কোন ঘন্টা বা কর্ণের সাদৃশ্য নেই। কবি জীবনানন্দ দাশ তাই ঘুঙুরের মতো ভাঁটফুল বলেছেন; ঐ শব্দের সাদৃশ্যে। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সে' গল্পের ঘন্টাকর্ণ চরিত্রটি নাম অনুসারে নির্মিত কাল্পনিক চিত্র-চরিত্র। ফুলের সাথে যদিও তার কোন যোগ নেই। মূল শব্দটি ভাট বা ভাঁট। এই ভাট, ভাঁট বা ভাঁটি মূলত একটি ঔষধি গাছ; যে গাছে ফুল হয়। তাই স্থানীয় লোকেরা এই গাছকে ভাঁটফুল বা ভাঁটিফুল গাছ বলে। জীবনানন্দ কবিতায় ভাঁটফুল শব্দই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শুদ্ধিকরণ মোহে ভাঁট বা ভাঁটি শব্দে রূপান্তরিত। যেমনঃ বেঞ্চ/বেঞ্চি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেরকম ভাঁটিফুল। এই গাছকে কেন্দ্র করেই হয় একটি পূজা। একটি সামাজিক বিশ্বাস। একটি লোকাচার বা মেয়েলী আচার। একটি মিথ। একটি লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান তথা একটি লোক-উৎসব।

ভাঁটি ফুল

ভাঁটিফুল গাছ

ভাঁটগাছ

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

এ ফুল দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সুগন্ধ যুক্ত। বাংলাদেশের খুলনাঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, প্রধানতঃ ভাঁট ফুল, বাসক ফুল ও বিলেই/বিড়েল আঁচড়ার ফুল, এই তিন প্রকার ফুলে বসন্তের দেবী সন্তুষ্ট হয়। এই তিন ফুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনটি ফুলই থোকায় থোকায় ফোটে এবং তিনটি ফুলই জংলী ফুল। মূলতঃ নিম্নবিত্তশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে এই ভাঁটিপূজা দিয়ে থাকে। সেই কারণে এই গানকে মেয়েলী গীতও বলে। উদ্দেশ্য, বসন্ত রোগ বা পক্স (Pox/chicken pox/small pox) প্রতিহত করা। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বসন্ত রোগ বা পক্স-এর দেবী হলেন শীতলা ঠাকুর। পক্স, হাম বা এই ধরণের চর্ম রোগ যাতে আক্রমণ করতে না পারে, তাই গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস ভাঁটিপূজা দিলে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

উদ্দেশ্য:

পৃথিবীতে যে জিনিস যত উপকারী, সংসারে তার গ্রহণযোগ্যতাও ততো বেশী। উপকারী জিনিসের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তিও বেড়ে যায়। প্রয়োজনে মানুষ তাকে দেবতা রূপে পূজা করতেও ভালবাসে। প্রয়োজনের তাগিদেই ধর্মের সৃষ্টি। দেবতার সৃষ্টি। কখনও কখনও ভয় থেকেও দেব-দেবতার সৃষ্টি হয়। আদিমকালের গুহাবাসী মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করতো। একত্রে শিকারে যেত। শিকারে যাওয়ার আগে তারা একত্রে প্রার্থনা করত। দলবদ্ধভাবে নৃত্য করত। হয়তোবা সেই সময় তারা তাদের শিকারের কৌশল বা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে নিত। গুহা বা গাছের গায়ে জীবজন্তুর ছবি এঁকে, সেটিকে ঘিরেই তারা নৃত্য প্রদর্শন করত। নিরীহ জন্তুর পাশাপাশি হিংস্র জীবজন্তুর ছবিও আঁকা থাকত। পরবর্তীতে অর্থাৎ বর্তমান সময়েও সেসব জন্তু দেবতারূপেই পূজ্য। যেমনঃ শূকর বা বরাহ দেবতা, গরু বা গোমাতা প্রভৃতি। বিভিন্ন জন্তু থেকে শুরু করে কাঠ-পাথর, এমনকি গাছ-গাছড়াও দেবতারূপে পূজিত হয়। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সাধারণ লোকেদের মধ্যেই এই প্রচলনটি লক্ষণীয়। কোন গাছের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

মাধ্যমে মানুষ উপকারী হলে ঐ গাছকে তারা দেবতারূপে শ্রদ্ধা বা পূজা করতে শুরু করে বা সেই গাছ বা গাছের ফুলকে কোনও দেবতার প্রধান ফুল হিসেবে দেবতার পায়ে অর্পণ করতে পারলেই তাদের আনন্দ। বাংলাদেশের খুলনা সহ আশেপাশের অঞ্চলে এই ভেষজ বা ঔষধি গাছ জন্মে যা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই উপকারী। তাই তার স্থান দেবতা বা দেবীর পায়ে হলে তার গুরুত্বও বাড়ে, এটাই স্বাভাবিক। তখন সেই ফুলের চাষ বা যত্নের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক ভাবেই বেশী হয়। সেই ফুলকে মানুষ ভালবাসতে শুরু করে। গুরুত্ব দিতে শেখে।

পূর্বে অন্যান্য জায়গার মতই খুলনাঞ্চলে ডাক্তার বা হাসপাতালের সংখ্যা খুবই কম ছিল। হাতুড়ে ডাক্তার বা কক-ডাক্তার এবং কবিরাজ, গুণিন বা ওঝা-ই ছিল একমাত্র ভরসা। সাধারণ রোগ-বালাইয়ে কবিরাজ বা এলাকার বয়স্ক লোকের ঝাড়ফুঁক ছিল সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জায়গা। সাধারণ জ্বর-জ্বালায় জল-পড়া, তেল-পড়ায় তারা বিশ্বাসী ছিল। বিভিন্ন গাছের শেকড়, ফল-মূল বা ফুল দিয়ে কবিরাজরা চিকিৎসা করতো। ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে ধূপ-ধুনো জ্বেলে রাখা বা কোনও গাছের পাতা/মূল রোগীর কাছাকাছি রাখা হত; যাতে বাতাসে দূষণ না ছড়াতে পারে। সমাজে ঐসব পাতা বা গাছ সবসময়ই যথাযথ সম্মান বা গুরুত্ব পেত।

ফাল্গুন, বসন্ত এসব শব্দ অন্য আবেশের সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের খুলনাঞ্চলে বসন্ত একটি মারাত্মক রোগ। বসন্ত বা Pox ছোঁয়াচে রোগ। এক জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তার আশেপাশের লোকেরাও আক্রান্ত হয়। আস্তে আস্তে ঐ পরিবার, পাড়া বা গ্রাম এবং ধীরে ধীরে পাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে বসন্ত রোগ। আগে মহামারীর আকার ধারণ করত। তখন এখনকার মত টীকার ব্যবস্থা ছিল না। তাই কবিরাজ, বৈদ্য বা যাদু বিশ্বাসই ছিল একমাত্র সম্বল। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ একত্রে এসব রোগ-ব্যাধি প্রতিহত করার চেষ্টা করত। বিভিন্ন রকম সংস্কার বা কুসংস্কারের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

উপর ভর করে এক-একটি অনুষ্ঠান পালন করা হত। সমাজে সে অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াদির বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সাথে আস্তে আস্তে তা একটি উৎসবে পরিনত হয়। পরিণত হয় একটি ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্ম বিশ্বাসে।

"সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র, সুন্দর তুলসীমঞ্চ বা সমাধীস্তম্ভ, রেড ইন্ডিয়ানদের টোটেম কাঠ, রাঢ় অঞ্চলে ধর্মপূজার থানে মাটির ঘোড়া, দেবদেবীর প্রতিমা, পূজার মন্ত্র, ধর্মীয় সংগীত, বাদ্য ইত্যাদি যাবতীয় কিছুর প্রধান মূল্য আমাদের নানা বিচিত্র জাদুবিশ্বাসে। এই অনুষ্ঠান করলে/মন্ত্র বল্লে/মূর্তির পূজা করলে আমাদের ইহলোকের এই চাহিদা মিটবে, পরলোকে এই অনুকূল ব্যবস্থা হবে, এই রোগ-ব্যাধি-অশান্তির নিরাময় বা উপশম হবে, আমাদের প্রয়াত আত্মীয়ের পারলৌকিক সদগতি..." (পবিত্র সরকার ৪) হবে। কিন্তু কবিরাজ-বৈদ্য বা জাদুকরদের ক্ষমতাও ছিল স্বল্প। তারা জল পড়া, তেল পড়া, ঝাড় ফুঁক-এর সাথে বিভিন্ন গাছ গাছড়া, শেকড়-বাকল দিয়ে বসন্ত রোগ তথা অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করতো। কখনও বসন্তের দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর পূজা করা হত। বিভিন্ন রকমের মানত করা হত। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই নিজের মত করে বা সামগ্রিক ভাবে এই পূজায় অংশগ্রহণ করত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও তাতে অংশ নিত। ভাঁটিপূজায় ছোটদের উপস্থিতিই লক্ষণীয়। পাঁচ-ছয় বছর থেকে শুরু করে পনের বছরের মেয়েরা ভাঁটিপুজোর প্রধান পূজারী তথা শিল্পী। ভোরে ঘুম থেকে উঠে পরিস্কার পোষাক পরে দল বেঁধে তারা ফুল তুলতে বেরিয়ে পড়ত। সেই ফুল দিয়েই পূজা দিত। গানই এই পূজার মন্ত্র। এই গানই ভাঁটিপুজোর গান বা ভাঁটির গান বা ফুল ভাঁটানের গান।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন পূজা তথা ধর্মীয় উৎসব আজ বিলুপ্তির পথে। চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির ফলে বিভিন্ন ধরণের প্রাচীন রোগ যেমন ওলাওঠা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি এখন আর দেখা যায় না। এমনকি পোলিও রোগটিও বিভিন্ন দেশে নির্মূল হয়েছে। বাংলাদেশ অনেক আগেই পোলিও মুক্ত। তাই সাধারণ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

মানুষ এখন এসব রোগে ভয় পায়না। সাধারণ মানুষ এখন অর্থনৈতিক ভাবেও স্বাবলম্বী। সাধারণ রোগবালাইয়ে শুধুমাত্র ঠাকুর-দেবতার উপর নির্ভর করেনা। সাধারণ রোগেও চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করায়। অবশ্য চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির সাথে সাথে নতুন নতুন রোগও তেমন বাড়ছে। গ্রাম্য চিকিৎসক বা কবিরাজ-বৈদ্য এসব রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ। গ্রাম উন্নীত হচ্ছে শহরে। গলিতে গলিতে ওষুধের দোকান। মোবাইল অ্যাপে বিভিন্ন রোগের ওষুধের নাম। কবিরাজ-বৈদ্য তাই এখন অনেকটাই উপেক্ষিত। এসব কিছুর সাথে সাথে লুপ্ত হতে চলেছে অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি, বিশ্বাস, সংস্কার তথা সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতি। সুসংস্কৃতিই হল একটি জাতির মেরুদণ্ড; তা নষ্ট বা লুপ্ত হওয়া মানে সেই জাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়া। ভাঁটিপূজা এলাকার ছোট ছোট মেয়েদের সুশিক্ষা দেয়। যেমন: গাছপালা তথা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখায়। দলবদ্ধ ভাবে চলতে শেখায়। পরস্পরের সাথে মিলেমিশে থাকতে শেখায়।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হলো লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের অমূল্য ভাণ্ডার থেকে একটি লোকসঙ্গীত হারিয়ে যাওয়া মানে আমাদের একটি গর্বের ধন হারিয়ে যাওয়া। তাই সময়ের সাথে সাথে এই ভাঁটিপূজার গান বিলুপ্তির পথে চলে যাওয়ার আগেই এই গানের চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রচার প্রয়োজন। নতুবা বাংলা লোকসঙ্গীতের ইতিহাস থেকে আরও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়বে; এমন ইতিহাস অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রচুর রয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে পাই 'প্রবন্ধ' গান। 'ধ্রুপদ' গানের প্রচলনও ক্রমশ কমতে থাকায় আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। একসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেয়াল গানের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেকে আজ শঙ্কিত। তাই লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ রাখতে ভাঁটিপুজার গান তথা এই ধরণের গান নিয়ে চর্চা, উপস্থাপন করা, সংরক্ষণ করা এবং তদুপরি গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

মূলবিষয়বস্তু:

"ভাঁটিপূজার গান, ভাঁটির গান, ফুল ভাঁটানের গান, ভাঁটি দেয়া বা কুলো ভাসানের গান মূলত ফাল্গুন মাসের শেষ দু'দিন এবং চৈত্র মাসের প্রথম দিন কুলো ভাসান পালন করা হয়ে থাকে" (বাসুদেব বিশ্বাস বাবলা ৫)। আর ভাঁটিপূজার গান খুবই প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। খুলনাঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য নদী। এই অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি হওয়ায় এখানে জোয়ার-ভাটাও বোঝা যায় স্পষ্ট। ভাটা এবং ভাঁটি ফুল এই দুই বিষয়ের কথা মাথায় রেখে এই পূজার নাম ভাঁটিপূজা হওয়ার সম্ভাবনা। গানের কথা, বক্তব্য বা বিষয়বস্তু, গানে উল্লেখিত ফুলের নাম যা এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়, রোগ যা এই অঞ্চলেই হত, এই পূজায় ব্যবহৃত প্রধান ফুল এবং গানের প্রচলিত সুর যা এই অঞ্চলের একেবারেই নিজস্ব সুর; সব মিলিয়ে ধারণা করাই যায় ভাঁটিপূজার গান এই অঞ্চলের গান। বিশিষ্ট্য লোকসংস্কৃতিবিদ শামসুজ্জামান খান তাঁর *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা খুলনা* গ্রন্থে ভাটিগান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, "এ গানের সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, জোয়ার-ভাটা হতো এমন জলাশয়ের কাছাকাছি কোথাও এ গানের উৎপত্তি হয়েছে" (৬)। ভাঁটিপূজার গানের ধারক ও বাহকেরা মূলত সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণী। গ্রামের অল্পশিক্ষিত ছোট ছোট মেয়েরা যাদের বয়স পাঁচ থেকে পনের বছর, তাদের পড়াশোনা সর্বোচ্চ অষ্টম শ্রেণী; তারাই এই গানের শিল্পী। তারাই পূজারী। এই পুজোয় কোন্ আরাধ্য দেবতার বন্দনা করা হয়, সেটি সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তারা যে বসন্ত বা পক্স-এর দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, খুলনাঞ্চল সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আগে বসন্ত বা পক্সে অনেক লোক মারা যেত। তখন মহামারির আকার ধারণ করত। এ রোগের কোনও ওষুধ ছিল না। অসহায়ের মত মৃত্যুমিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। একমাত্র অবলম্বন ছিল ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি। সাধারণ মানুষের ধারণা এই রোগের

দেবতা শীতলা দেবী। শুরু হয় তাঁর পূজা। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, এই দেবী স্থানীয় ফুল যেমনঃ মোরগ ফুল, ঢোসকমলি ফুল, কল্কে ফুল, শাপলা ফুল, কচুড়ীপানার ফুল ইত্যাদি ফুলে সন্তুষ্ট। তাই দিয়েই তাঁর পূজার আয়োজন করা হয়।

কোনও জায়গায় হিঁচড়াই মাগী বা হ্যাঁচড়াই মাগি, কোথাও মা ঠারোনী, কোনও জায়গায় কোঠো ঠাকুর আবার কোথাও বা দয়াল ঠাকুর বলে তারা আরাধ্য দেবতাকে ডেকে থাকে। তাদের বিশ্বাস এই পূজার আসরেই ইষ্টদেবতা হাজির হয়ে তাদের প্রার্থনা শোনে। তাই তারা ডাকে:

দয়াল তুই আয়রে আয়,

এই আসরে না আসিলে

বালক মারা যায়।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ীর আশেপাশের ৭/৮ টি মেয়ে একত্রে ফুল তুলতে বের হয়। রাস্তার পাশের ফুলগাছ বা কারও বাড়ীতে লাগানো ফুলগাছ থেকেই তারা মূলত ফুল সংগ্রহ করে। একজন ঘুম থেকে উঠে অন্যদের ডেকে তোলে। পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে কুলা, বড় থালা বা চালুনী নিয়ে ফুল, পাতা সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে। স্থানীয় ফুল যেমন গাঁদা ফুল, জবা ফুল, টাইম ফুল, মোরগ ফুল, দোপাটি ফুল, আকন্দ, কাঠ গোলাপ, কুঞ্জলতা ফুল, বেল ফুল, ঢোসকমলি ফুল, কল্কে ফুল, অতসী ফুল, অপরাজিতা, কলমি ফুল, হাসনাহেনা, গন্ধরাজ, ভুঁই চাঁপা, বকফুল, রঙ্গন, শাপলা ফুল, কচুড়ীপানার ফুল, শেফালী ফুল, বাসক ফুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ফুল, শিয়ালকাঁটা ফুল, কেলকদম বা কেলি কদমফুল, ধুতরা ফুল, পেঁপের ফুল এবং অবশ্যই ভাঁটিফুল; ফুলের পরিমান কম হলে বিভিন্ন ফুলের দেখতে সুন্দর এমন পাতা

তুলে বাড়ি এনে কুলা বা বড় থালায় সুন্দর করে সাজিয়ে স্থানীয় গাছতলায় হাজির হয়। ফুল তুলতে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও মধুর। গ্রামে সাধারণত বুনোফুল প্রচুর ফোটে। তবে সবার আগ্রহ থাকে কারো চাষের বা লাগানো ফুল গাছের প্রতি। বেড়া ডিঙিয়ে বা ভেঙে ফুল বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফুল বা পাতা তুলেই দে ছুট। কখনও গৃহকর্তা নালিশও জানায় মেয়েদের অবিভাবকের কাছে। তবে অধিকাংশ সময়ই ঠাকুরের নামে তা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়।

বাচ্চাদেরই চর্মরোগ বেশি হয়, তাই অবিভাবকেরা ছোটদেরকে বিভিন্ন সামাজিক সুসংস্কারের মাধ্যমে তাদের সচেতন করেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে পূজা-পাঠ সবই তার মধ্যে পড়ে। ছোট ছোট মেয়েরাই ভাঁটিপূজার পূজক। তাদের পক্ষে মন্ত্র উচ্চারণের চেয়ে ছড়া আওড়ানোই সুবিধাজনক। এজন্য মন্ত্রহীন সঙ্গীতই এই পূজার অন্যতম মাধ্যম। চর্মরোগে হ্যাঁচড়া মাগী বা হ্যাঁচড়াই দেবীকে (শীতলা বা ভাটিশ্বর গোঁসাই) আরাধনা করা হয় ভাঁটিপূজার মাধ্যমে। জনাব ওয়াকিল আহমদ তাঁর গ্রন্থে যেমন উপাসনার বেদিতে প্রতীক রূপে কুল গাছের ডাল রাখার কথা বলেছেন যার কাঁটার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে চর্মরোগের যন্ত্রণার সাদৃশ্য রয়েছে (৭)। কোন কোন জায়গায় গাছতলা বা মন্দিরের পরিবর্তে জোয়ার ভাটা হয়, এমন নদীর তীরেও তারা পূজার জন্য মিলিত হয়। গাছতলা বা পূজার স্থানে যাওয়ার সময় আশেপাশের সব মেয়েরা একত্রিত হয়েই রওনা হয়। ছোট্ট ছোট্ট দলে সবাই নিজের মত করেই আগে থেকে প্রস্তুত থাকে। ছোট ছোট ছেলেরাও সাথ নেয়। দর্শক হিসেবে তাদের ভূমিকাও চোখে পড়ার মত। ৪/৫ বছরের মেয়েদের মা বা পিসীরাও তাদের সাথে যায়। স্থানীয় দুএকজন বয়স্ক বিধবা মহিলারা পুরো পূজাটি ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তা দেখাশোনার দায়িত্বে থাকে।

মন্দির বা স্টেজ:

মেয়েরা একটি গাছ বা প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে গোল হয়ে বা সারিবদ্ধ হয়ে বসে। ফুলের ডালি সামনে থাকে, যাতে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

করে ইষ্ট দেবতাকে সহজে ফুল দিতে পারে। প্রতিকৃতিটি কোনও গাছের গুড়ি হতে পারে, যার গায়ে সিঁদুর লাগানো। বা গাছটির গোড়ায় সিঁদুর লাগানো; যা দেখে ভক্তি আসে। কখনও তা একটি বড় পাথর খণ্ডও হতে পারে। নদীর পাড়ে বসলে, সেই জায়গাটি পরিষ্কার করে সেখানেই বসে পুজো শুরু হয়। বসার জায়গা নিজেরাই বসার আগে পরিষ্কার করে নেয়। ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে গোবর-জল দিয়ে লেপন করা হয়। তাতে জায়গাটি শুদ্ধ হয়। এর পর শুরু হয় ভক্তিভরে পূজা। মাধ্যম লোকসঙ্গীত। অতিপ্রচলিত গানটি নিম্নরূপ:

হিঁচড়াই মাগী তোর পিচড়াই চুল

তাইতি দেবো আমরা ধুতরো ফুল।

ধুতরো ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা জবা ফুল।

জবা ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা শিয়েল কাঁটা ফুল।

শিয়েল কাঁটা ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা গ্যান্দা ফুল।

গ্যান্দা ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা কেলকদম ফুল।

কেলকদম ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা কিষ্ণচূড়া ফুল।

কিষ্ণচূড়া ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা রাধাচূড়া ফুল।

রাধাচূড়া ফুলি যদি না নেয় মন

তাইতি দেবো আমরা বায়োসের ফুল।

বায়োসের ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা বিলেই আচড়ার ফুল।

বিলেই আচড়ার ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা ভাঁটির ফুল।।

(এইভাবে তাদের সংগৃহীত বিভিন্ন ফুলের নাম করে করে গানটি গাওয়া হয় এবং ফুলের নামানুসারে সেই ফুল বেদীতে দেওয়া হয়)

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

[আকার মাত্রিক স্বরলিপির মাধ্যমে গানটির স্বরলিপি দেখানো হল]

।। সা সা সা রা । সা -া ধা -া । সা সা সা রা । মা গা রা সা।

হি চ ড়া ই মা গী তো র পি চ ড়া ই চু ০ ০ ল

। মা মা মা পা । গা -া সা রা । গা মা গা রা । সা -া -া -া ।

তা ০ ই তি দে বো আম রা ধু ত রো ০ ফু ০ ০ ল

তা ০ ই তি দে বো আম রা জ ০ বা ০ ফু ০ ০ ল

। ধা সা সা সা । সা সা সা ধা । সা সা সা রা । মা গা রা সা ।।

ধু ত রো ০ ফু লি য দি না ০ নে য় ম ০ ০ ন

জ ০ বা ০ ফু লি য দি না ০ নে য় ম ০ ০ ন

[পরবর্তী কথাও একই সুরে প্রচলিত]

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

এই গানটি অঞ্চল ভেদে একই সুরে ভিন্ন কথায়ও হয়ে থাকে। শুরুটা অন্য কথায় হলেও পরবর্তী অংশগুলি একই থাকে। ভক্তি ও বিষয়বস্তু একই থাকে:

"ডাল ভাঙ্গে না ডাল ভাঙ্গে না ডালে চড়ে যাবো

মাঠারোনী চালি ফুল সাজি ভরে দেবো।

সেই ফুলি যদি না নেয় মোন

তাইতি দেবো আমরা ধুতরো ফুল।...

একই গান একটু নিম্ন অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত খুলনা জেলার আরও দক্ষিণে গেলে তারা একই সুরে একটু অন্য কথায় গানটি গায়:

এচড়ায় প্যাচড়াই মাগীর নম্বা নম্বা চুল

তাইতি যদি না নয় মন

তানলি দেবো আমরা নুনা ভাঁটির ফুল।

নুনা ভাঁটির ফুলি যদি না নয় মন

তানলি দেবো আমরা বিরেল হ্যাচড়ার ফুল।...

কখনও বা আরও একটু অন্য রকম কথা:

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

নোনা ভাটির পঞ্চডাল

ভাটি দেবো কতকাল

ও ভাটি তুই সরে যা

কুলো ধুয়ার জায়গা দিয়ে যা।

জবা ফুলের পঞ্চডাল

ভাটি দেবো কতকাল

ও ভাটি তুই সরে যা

কুলো ধুয়ার জায়গা দিয়ে যা।

অশোক ফুলের পঞ্চডাল

ভাটি দেবো কতকাল

ও ভাটি তুই সরে যা

কুলো ধুয়ার জায়গা দিয়ে যা"। (বাসুদেব বিশ্বাস বাবলা ৮)

অঞ্চল ভেদে পদ আলাদা হলেও সুর এবং সুরের আকুতি একই থাকে। কারণ বক্তব্য তথা বিষয়বস্তু তো একই। বসন্তের

দেবীকে তথা দেবী শীতলাকে বন্দনা করা। তার স্মরনাপন্ন হওয়া। তিনি শান্ত হলেই এই সব রোগব্যাধি দূর হবে। শামসুজ্জামান খান তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, *খুলনার লোকসংগীত* গ্রন্থে নূর মহম্মদ টেনা এই গানকে বসন্ত বিদায়ের গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন" (৯)। বসন্ত বিদায়, নাকি বসন্তের প্রতিরোধ, এটি ভাববার বিষয়! বিষয়বস্তু যাই-ই হোক্ না কেন, এ গানের শৈল্পিক মানের কোনও তুলনা নেই। পূজারিণী শিল্পীরা গানের কথার সাথে সাথে ফুলটিও হাতের কাছে রাখে; পুরোহিত যেমন পূজার সময় প্রতিটি মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে ফুল, বেলপাতা বা দূর্বা হাতে তুলে নেয় এবং দেবতার পায়ে ছিটিয়ে দেয়, তেমনি শিল্পীরাও গানের সাথে সাথে নির্দিষ্ট ফুল দেবতার পায়ে অর্পণ করে। যেমন: হিঁচড়াই মাগী তোর পিচড়াই চুল, তাইতি দেবো আমরা ধুতরো ফুল...; লাইনটি গাইতে গাইতে ধুতরো বা ধুতরা ফুল হাতে তুলে নেয় এবং গানের কথাটি গাইতে গাইতে ফুলটি দেবতার পায়ে দেয়। কখনও কখনও তারা ডালি/কুলাতে সেভাবেই সাজিয়ে নেয়। কখনও বা ডালিতে সাজানো ফুল দেখে দেখে তারা গাইতে থাকে। অনেকটা পটচিত্রের মত। সুরে সুরে, তালে তালে চলতে থাকে গান এবং নৈবেদ্য স্বরূপ ফুল অর্পন। একই ধরণের ফুল ঠাকুরকে দেয়া হয় এক সাথে গাইতে গাইতে। যদি কারো কাছে ভিন্ন ধরণের ফুল বা পাতা থাকে তবে তা পরবর্তীতে দেয়া হয়।

পূজার সময় একজন মূল গায়েন থাকে, সে প্রথম লাইনটি গেয়ে দেবতার পায়ে সেই ফুল দেয়। সে অনেকটা পুরোহিতের মতই পুরো বিষয়টি পরিচালনা করেন। তার পর সবাই একত্রে ঐ লাইন গেয়ে এক সাথে ফুল দেয়। মূল গায়েন পরিবর্তন হয়। কারণ, কেউই প্রথাগত ভাবে শেখা শিল্পী নয়। যে যার মনের মত করে গান করে। তবে পুরো ব্যাপারটি সংগঠিত হয় খুব সুশৃঙ্খল ভাবে। পোষাক পরিচ্ছেদের ব্যাপারে কোনও বাধ্য বাধকতা নেই। তবে প্রতেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে পূজার আসরে উপস্থিত হয়। কারণ, এটি শুধুমাত্র গান নয়; পূজাও বটে। গ্রামের মেয়েদের বিশ্বাস, কেবলমাত্র পরিষ্কার পোশাকেই ফুলে হাত দেওয়া যায়। নতুবা ইষ্টদেবতা রুষ্ট হয়। "তাই তারা প্রথম

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থেকেই পবিত্রতার দিকে খেয়াল রাখে। অপরিষ্কার পোষাক এই সংগীত অনুষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করে- এই বিশ্বাস দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এটা ধর্মীয় বা সংস্কৃতিগত প্রথা” (বাসুদেব বিশ্বাস বাবলা ১০)।

এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে কোনও বাদ্যযন্ত্র বা বাদ্যযন্ত্রীর দরকার পড়ে না। কোনও interlude বা prelude music-এর ব্যাপার নেই। সুরে সুরে, তালে তালে তারা গাইতে থাকে। এলাকায় যেন কোনও অনিষ্ট না হয় সেই প্রার্থনা তাদের মনে। সেই প্রার্থনা তাদের গানে। আনদ্ধ বাদ্যের জায়গায় তারা ঘনবাদ্য যেমন: কাঁসার থালা বা স্টিলের থালা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তবে তা ভাসান পর্বে। সব ফুল ঠাকুরকে দিয়ে পূজা শেষ করে ঐ ফুল পাশে বয়ে যাওয়া নদী বা খালে বিসর্জন দিতে যায়। তখন তারা সাথে থাকা কুলা বা থালা বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে যায়। ফুলের পরিমাণ এবং প্রকার ভেদের উপর নির্ভর করে গানের আকার; যে, কয় মিনিট হবে গানটি। মূল গান একটি-ই। তাতেই যথেষ্ট সময় লাগে। এরপর পূজা শেষ হলে স্থানীয় লোকগান যেমনঃ ভাটেল বা ভাটিয়ালী, বিভিন্ন ভক্তিগীতি ইত্যাদি গান অনুরোধ করে, যার কণ্ঠে ভাল সুর আছে তাকে। কখনও নিজেদের মধ্যে একে অন্যজনকে গান গাইতে অনুরোধ করে। মূল গান ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন জনে গায়। ঘরের কাজ কর্মের জন্যে খুব বেশী দেরী করাও চলে না গাছতলায়। তাড়াতাড়ি রওনা হয় নদীর দিকে। হৈ হৈ করতে করতে আশেপাশের নদী, খাল বা পুকুরে গিয়ে ফুল বিসর্জন দেয়। মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে, যেন এলাকার কারও বসন্ত, হাম বা ছোঁয়াচে কোনও রোগ না হয়। কোনও প্রকার ঘা, পাঁচড়াও যেন কারো শরীরে না দেখা দেয় তার জন্যেও প্রার্থনা করে। ফলে ফুলে যেন ভরে থাকে আশপাশ। প্রচুর গাছগাছালি যেন জলবায়ু কে সুন্দর রাখে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি যেন মানুষের ক্ষতি না করে।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

উপসংহার:

বাংলা লোকসঙ্গীতের বহু জনপ্রিয় গানই আজ বিলুপ্তির পথে। কারণ হিসেবে ধরা যায়, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তার চেয়েও বড় ভূমিকা নেয় যথাযথ প্রচারের অভাব। অনেক গান তো প্রচারের অভাবে লোকসঙ্গীত জগতে ঢুকতেই পারেনি। আবার কিছু গান আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতায় বদ্ধ হয়ে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে গান আঞ্চলিক মানুষের জীবনের গান, মননের গান, তাদের যাপনের গান সে গানের বিলুপ্তি মানে লোকসঙ্গীত তথা লোকসংস্কৃতির ক্ষতি।

ভাঁটিপূজার গানের সুর, তাল, ছন্দ বা বিষয়বস্তু শিক্ষিত সমাজের কাছে মূল্যহীন হতে পারে, কিন্তু আঞ্চলিক মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তি, তাদের সমাজ চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। একে অপরকে নিয়ে বেঁচে থাকতে শেখায়। পরস্পরকে ভালবাসতে শেখায়। উপকার করতে শেখায়। অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে শেখায়; যা বর্তমান পৃথিবীর জন্য একান্ত দরকার। লোকসঙ্গীত শুধু মানুষের আনন্দের খোরাক নয়; সমাজের অবক্ষয় রোধে তথা সমাজ চেতনায় এর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, ওয়াকিল। *লৌকিক জ্ঞানকোষ*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা: গতিধারা, ২০১১। প্রিন্ট।

খান, শামসুজ্জামান সম্পাদিত। *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা খুলনা*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১৪। প্রিন্ট।

জলিল, ডঃ মুহম্মদ আবদুল। *লোকসাহিত্যের নানা দিক*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩। প্রিন্ট।

বাবলা, বাসুদেব বিশ্বাস। *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২। প্রিন্ট।

ব্রহ্মচারী, স্বামী অচ্যুতানন্দ কর্তৃক সংকলিত। *অভিনব বাংলা অভিধান*। একাদশ সংস্করণ। কলকাতা: দি ইউনিক বুক সেন্টার, কলকাতা। ২০১৫। প্রিন্ট।

ভাঁটফুল – প্রথম আলো। ৮ মে ২০১৯। ওয়েব।

মিজান, মোরসালিন। "রাস্তার ধারে অযত্নে ফোটা ফুল বেহুলার পদচিহ্ন"। দৈনিক জনকণ্ঠ। জনকণ্ঠ লি., ১১ জুন ২০১৯। ওয়েব।

সরকার, পবিত্র। *লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি, কলকাতা। ১৯৯৬। প্রিন্ট।

Sadi, Anup। "পাহাড়ি ভাঁট বা ঘেঁটু একটি ভেষজ দৃষ্টিনন্দন ফুল"। রোদ্দুরে। ১১জুন ২০১৯। ওয়েব।